গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা | ২৫ এপ্রিল - ১ মে ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

খুঁটিয়ে রাজনীতি বুঝুন, নইলে প্রতারিত হতে হবে

প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

২৪ এপ্রিল ২০২৫। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে সমাবেশ। বৈশাখের প্রখর রোদে পুড়ে যাচ্ছে মাঠ— গোটা দেশের তপ্ত হয়ে ওঠা পরিস্থিতিরই প্রতিফলন যেন। তারই মধ্যে রাজ্যের প্রান্ত-প্রত্যন্ত থেকে আসা ত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা নিলেন। কেউ পেতে রাখা চেয়ারে, কেউ নীচে ঘাসের উপর, মাটিতে কাগজ বিছিয়ে। কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন আগের দিন, কেউ বা এ দিন ভোরে। সঙ্গে আনা চিঁড়ে-মুড়ি-বাদামভাজা খেয়ে খিদে মিটিয়ে দ্রুত তাঁরা তৈরি হয়েছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শুনবেন বলে।

বিকেল তিনটে থেকেই মঞ্চ সোচ্চার ছিল উচ্চকিত স্লোগানে। এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা সংবলিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

পাঁচের পাতায় দেখুন

কেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে বিপর্যস্ত হল

প্রভাস ঘোষ

আন্তর্জাতিক 'হ্যামার' পত্রিকার অনুরোধে এস ইউ সি আই (সি) -র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের লেখা এই নিবন্ধটি প্রথম ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর দলের ইংরেজি মুখপত্র প্রোলেটারিয়ান এরার ১ এপ্রিল ২০২৫ সংখ্যায় 'হোয়াই ওয়াজ সোসালিস্ট সিস্টেম ডিসম্যান্টলড বাই কাউন্টার রেভলিউশন' নামে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রোলেটারিয়ান এরায় প্রকাশের সময় তিনি সামান্য কিছু সম্পাদনা করেন। আমরা ওই নিবন্ধেরই বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করলাম। অনুবাদের ভুলত্রুটির দায়িত্ব আমাদের — সম্পাদক, গণদাবী।

বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাগুলির অন্যতম হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়। অসাধারণ বিকাশ এবং অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু এই বিপর্যয় কি অনিবার্য ছিল? এই প্রসঙ্গে আমরা ইতিহাস থেকে যে শিক্ষাটি নিতে পারি— কোনও আদর্শের চূড়ান্ত বিজয় বা কোনও নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সময় লাগে। ধারাবাহিক ভাবে পরাজয়, পরাজয়, তারপর জয়, আবার পরাজয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় আসে। এতে দশকের পর দশক, এমনকি কয়েক শতাব্দীও পার হয়ে যায়। কয়েক হাজার বছর লেগেছিল দাস ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে, যাকে 'ঐশ্বরিক শাসন' বলে দাবি করা হত। সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিজয় পেতে অর্থাৎ

ছয়ের পাতায় দেখুন

পহেলগামে পর্যটকদের উপর কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা

২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরে পর্যটকদের গুলি করে হত্যার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ২৩ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু এবং ১২ জনেরও বেশি মানুষের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় সারা দেশের মানুষের সাথে আমরাও গভীরভাবে মর্মাহত। জানা যাচ্ছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন (ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ) ঘটানোর প্রতিশোধ নেওয়ার অজুহাতে নিষিদ্ধ লস্কর-ই-তৈবা গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) এই কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে। আমরা এই বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা করছি।

এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল, কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি যতই করুক তারা সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ।

আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি, নিহত ও আহত সকলের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এই পরিবারগুলির যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে আমরা দাবি জানাচ্ছি, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে জড়িত সমস্ত অপরাধীকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে। জম্মু-কাশ্মীর সহ দেশের সকল অংশের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এই জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বরকে তীব্রতর করুন।

ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধের রমরমা কী করে

ভেজাল ওষুধ এবং অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধে ভারতের বাজার কী ভাবে ছেয়ে গেছে তার সংবাদ সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর কারণটা কি কেবল ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সরকারের সদিচ্ছার অভাব, নাকি সরকার এবং প্রশাসনের মদতেই রমরমিয়ে চলছে এই মারণ-চক্র?

সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির স্যালাইন রিঙ্গারস ল্যাক্টেট এর বিষক্রিয়ায় এক প্রসূতির মৃত্যু ঘটল। সাসপেন্ড করা হয় এক ডজন চিকিৎসককে। অথচ ওই ওষুধ কোম্পানিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করা হল না, শাস্তি দেওয়া তো দুর অস্ত। এর বিরুদ্ধে তীব্র জনরোষ ফেটে পড়ল। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন ইত্যাদি সংগঠনের তীব্র আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয় ওই কোম্পানির ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে। অথচ ২০২৪ এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে উক্ত স্যালাইন কর্ণাটক রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সেখানেও ওই স্যালাইনের বিষক্রিয়ায় প্রসূতি মৃত্যু হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ, কর্ণাটক সরকার এই ঘটনা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে সতর্ক করেছিল। তা সত্ত্বেও ওইসব ভেজাল ওষুধ রমরমিয়ে এ রাজ্যে চলছে।

এর সঙ্গে দোসর হয়েছে নিম্নমানের ওষুধ। অর্থাৎ যতটা পরিমাণে ওষুধের উপাদান থাকার কথা তার থেকে কম পরিমাণে এবং নিচু মানের হওয়ার ফলে বহু ওষুধে রোগ সারছে না। কম মাত্রার উপাদানযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে সেগুলি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। নামীদামি ওষুধ কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটছে। এর ফল মারাত্মক আকারে দেখা দিচ্ছে।

ওষুধ ব্যবসায়ে সরকারি বদান্যতায় উৎপাদনের ওপর ৩০০ শতাংশ থেকে ৩০০০ শতাংশ পর্যন্ত লাভ করে থাকে ওষুধ কোম্পানিগুলো। এরপরেও ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে বা ওষুধের মান নামিয়ে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা আকাশ ছোঁয়া মুনাফা করছে। স্পষ্ট যে, মুনাফার কাছে মানুষের জীবন, বাঁচা-মরা, নীতি-নৈতিকতা মূল্যবোধ এ সব অর্থহীন।

সরকারের অদক্ষ পরিচালনা

দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি ভেজাল ওষুধ ভারতে রমরমিয়ে চলছে। বর্তমানে তা আরও বেড়েছে। প্রথমত ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ল্যাবরেটরি দেশের কোনও রাজ্যেই নেই। যেটুকু আছে সেগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেকনিশিয়ান নেই এবং যন্ত্রপাতি মান্ধাতার আমলের। ওইসব যন্ত্রের দ্বারা ওষুধের পরিমাণগত দিক কিছুটা অর্থে দেখা সম্ভব হলেও, ওষুধে অন্য কোনও ভেজাল আছে কি না বা কোনও ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু আছে কি না তা নির্ণয় করার মতো ল্যাবরেটরি দেশে খুব কমই আছে। ল্যাবরেটারিতে গুণমান পরীক্ষার জন্য ওষুধ পাঠানোর পরে রিপোর্ট আসতে ছ'মাস থেকে এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। নিয়ম অনুযায়ী গুণমান পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ওষুধ ব্যবহার করার কথা নয়। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে তার আগেই ওইসব ওষুধ ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে। ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

দ্বিতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ৯০ দিনের মধ্যে কোম্পানিতে ফেরত দেওয়ার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওইসব ওষুধ ঘুরপথে চোরা কারবারিদের হাতে পৌঁছায় এবং তা রিসাইক্লিং হয়ে নতুন মোড়কে বাজারে ফেরত আসে।

তৃতীয়ত, বর্তমানে রাজ্যগুলো ওষুধের ওপর জিএসটি চালু করার ফলে আশেপাশের রাজ্য থেকে অনামি কোম্পানি থেকে নিম্নমানের ওষুধ বিভিন্ন রাজ্য কেনে, যা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ওই সব কোম্পানিতে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এইসব নিম্নমানের ওষুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও প্যাকেজ পরিবর্তন করে ব্যবহৃত হতে থাকে।

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তর থেকে আচমকা ভিজিটের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হোলসেল মার্কেটেও এমন কিছু ওষুধের প্যাকেট পাওয়া গেল, যার মধ্যে নামিদামি কোম্পানির ওষুধের সাথে অনামী এবং ভেজাল ওষুধ মেশানো আছে। এ একটা ভয়ংকর প্রবণতা।

আরজিকর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের নৃশংসতম খুন এবং ধর্ষণের ঘটনার পেছনেও জাল ওষুধের কারবারই উঠে এসেছে। ওই কলেজেরই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সরকারি সরবরাহের মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধগুলো প্যাকেজ বদলে দিয়ে বাজারে ছাড়ছিলেন। তার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক, স্যালাইন সহ বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধও ছিল। এই চক্রে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরিণতিতেই ওই তরুণী চিকিৎসককে প্রাণ দিতে হল, এমন অভিযোগ সর্বত্রই উঠেছে।

ভেজাল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণটি অবশ্য স্পষ্ট। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছিল— ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে ৩৫টি ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থা বিজেপি, তৃণমূল সহ বিভিন্ন দলকে নির্বাচনী তহবিলে অনুদান হিসেবে ২০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। এর মধ্যে সাতটি বৃহৎ কোম্পানি রয়েছে যাদের উৎপাদিত ওষুধ গুণমান পরীক্ষায় ফেল করার পরে তারা ওইসব বন্ড কেনে এবং যথারীতি ওইসব ওষুধ এক অদৃশ্য জাদুবলে বাজারে চলতে থাকে।

দায়ী সরকারি নীতি

১৯৬০ পর্যন্ত এ দেশে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ছিল। কারণ ওই সময় পর্যন্ত এ দেশে গড়ে ওঠা ওষুধের জাতীয় শিল্প যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল, আইডিপিএল, হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিকস, বেঙ্গল ইমিউনিটি ইত্যাদি কোম্পানিগুলো থেকে উন্নত মানের এবং প্রচুর পরিমাণে ওষুধ তৈরি হত যা সুলভে পাওয়া যেত। ১৯৯১ সালে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এ দেশে জাতীয় ভেষজ নীতি চালু হয়। জাতীয় ওষুধ শিল্পগুলোকে ক্রমশ রুগ্ন করে দেওয়া হয়। যার পরিণতিতে বর্তমানে বেঙ্গল কেমিক্যাল টিম টিম করে চললেও বাকি ওষুধ কোম্পানিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশীয় বেসরকারি ওষুধ কোম্পানিগুলোর মুনাফা সুনিশ্চিত করা এবং ২০০০ সাল থেকে ওষুধের বাজার আরও খুলে দেওয়ায় বিদেশি কোম্পানিগুলো এ দেশে ব্যবসা করতে ঢুকে পড়ে এবং ভারত সরকার এফডিআই তথা ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট চালু করে এবং বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ১০০ শতাংশ করে দেওয়া হয়। যার প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে ২০০২ সালের নতুন জাতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং পলিসির উপরে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকা সফরের আগে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সরকারি নীতি ডিপিসিও-২০১৩ অর্থাৎ ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারের উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। আগে যেখানে ৩৪৮টি ওষুধ মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় ছিল তার মধ্যে ১০৮টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের উপর থেকে সরকারি মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে হার্ট, ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের এবং গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ও জীবন দায়ী ওষুধ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বছরে বছরে কোম্পানিগুলোকে ওষুধের দাম বাড়ানোর সুযোগ করে দেয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ড্রাগ প্রাইসিং অথরিটির মাধ্যমে ৭৪৮টি ওষুধের বাজার মূল্য প্রায় দুই শতাংশ হারে বাড়ানোর অনুমতি দিয়ে দিল। ওষুধের বাজার মূল্য ২০২২ এবং '২৩ সালে যথাক্রমে ১০ এবং ১২ শতাংশ বৃদ্ধিকরা হয়েছিল। ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ওষুধের বাজার মূল্য সম্পূর্ণরূপে বিনিয়ন্ত্রিত করে দিল। অর্থাৎ বর্তমানে ওষুধের মূল্য পুরোপুরি ওষুধ কোম্পানিগুলোই নির্ধারণ করতে পারবে। এই ভাবে সরকার হাত গুটিয়ে নিয়ে কোম্পানিগুলিকে ইচ্ছামতো দাম বাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে। অন্য দিকে প্রয়োজনীয় ওষুধের মাত্র ১৬ শতাংশ ওষুধ সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীরা পেয়ে থাকেন। বাকিটা বাজার থেকে কিনতে হয়।

ফলে ওষুধের পেছনে খরচ করতে গিয়ে বহু মানুষ আজ সর্বস্ব খোয়াচ্ছেন। তথ্য বলছে, ভারতে চিকিৎসার জন্য যা খরচের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ খরচই ওষুধের জন্য হয়ে থাকে। চিকিৎসার খরচ মেটাতে ৪০ শতাংশ রোগীর পরিবারকে তীব্র আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। ২৫ শতাংশ মানুষ এপিএল স্তর থেকে বিপিএল স্তরে নেমে যায়। এর পুরো দায় 'জনসেবক' সরকারের।

জরুরি কর্তব্য

এর থেকে পরিত্রাণের কি কোনও উপায় নেই? কিছু উপায় অবশ্যই আছে— ১) হাতি কমিটির সুপারিশ মেনে ব্র্যান্ডনামে ওষুধ উৎপাদন বন্ধকরতে হবে। জীবন দায়ী এবং অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে হবে। ২) রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং জীবন দায়ী ও বেশিরভাগ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরকারি ওষুধ কারখানা থেকেই তৈরি করতে হবে। ৩) ওষুধ কোম্পানিগুলির লাভের সীমা বেঁধে দিতে হবে। ৪) জীবনদায়ী এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধগুলি সরাসরি হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ করতে হবে। ৫) ওষুধের গুণমান দেখার ব্যবস্থা জোরদার করতে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি এবং উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু সরকার নিজে এমন উদ্যোগ নেবে না। তাকে এ কাজে বাধ্য করতে সর্বত্র জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ কাজে নাগরিক সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া ড্রাগ মাফিয়াদের অতিমুনাফার থাবা থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র নদিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা কমিটির আবেদনকারী সদস্য ও হাঁসপুকুরিয়া ইউনিট ইনচার্জ কমরেড সাত্তার আলি মণ্ডল ৩ এপ্রিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ৬৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শহিদ কমরেড আব্দুল ওদুদের সঙ্গে কমরেড সাত্তার মণ্ডলের প্রথম যোগাযোগ হয় এবং মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ও চিন্তাকে গ্রহণ করে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বেই একদল ছাত্র-যুবককে নিয়ে হাঁসপুকুরিয়া গ্রামে একটি ইউনিট গঠিত হয়। একদিকে প্রবল আর্থিক সংকট, অন্য দিকে বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষত সিপিএম এবং পরবর্তীকালে তৃণমূলের ভীতি প্রদর্শন, চাপ, হুমকি সবকিছুকে উপেক্ষা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টির আদর্শকে বুকে বহন করেছেন এবং সংগঠনকে অটুট রেখে গেছেন।

অত্যন্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, প্রথাগত পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ না পেয়েও আদর্শনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা এবং সমস্ত রকমের সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মানসিকতা তাঁকে এলাকার একজন প্রভাবশালী মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়।

গ্রামীণ ডাক্তার, মৃদুভাষী কমরেড সাত্তার মণ্ডল তাঁর পেশা এবং অনমনীয় আদর্শনিষ্ঠার জন্য এলাকার বহু মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

১৬ এপ্রিল কমরেড সাত্তার আলি মণ্ডলের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয় হাঁসপুকুরিয়া বাসস্ট্যান্ডে। তাঁর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন দলের বারুইপাড়া, কুলগাছি সহ বিভিন্ন ইউনিটের কর্মীরা। মাল্যদান করেন দলের অবিভক্ত জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পরেশ হালদার, লহিরুদ্দিন সেখ, বাতশোভা বেগম, কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখ এবং দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও নদিয়া উত্তর জেলা সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। স্মৃতিচারণ করেন নদিয়া দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পরেশ হালদার ও কমরেড জাকিমউদ্দীন সেখ। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। সভাপতিত্ব করেন কমরেড লালচাঁদ সেখ।

কমরেড সাত্তার আলি মণ্ডল লাল সেলাম

আদর্শের আসল মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সাংস্কৃতিক-নৈতিক মানের উপর

শিবদাস ঘোষ

বর্তমানে জাতির জীবনে নৈতিক অধঃপতন একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা একটা গোষ্ঠী ক্রিয়াকলাপ, শুধু এই ভাবে বললে অবস্থাটাকে খাটো করে দেখা হয়। আমাদের সমস্ত জাতিটার মধ্যে নৈতিক অধঃপতন, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যাচার, লোক ঠকানো, কর্তব্যে অবহেলা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কাপুরুষোচিত আক্রমণ আজ একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কি শাসক দলের, কি বিরুদ্ধ দলের রাজনীতির মধ্যে এ সব ঢুকে গেছে। আমি তার থেকে আমাদের দলকেও বাদ দিতে চাই না। তবে এটুকু বলব, আমাদের দল এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার আছে। আমরা নিজেদের এ সব থেকে রক্ষা করবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। কিন্তু এ কথা বলি না যে, এই সর্বাত্মক, সর্বগ্রাসী যে বিরুদ্ধ পরিবেশ এবং আবহাওয়া, তার প্রভাব থেকে আমাদের দলের সমস্ত ছেলে, সমস্ত কর্মী এবং সমর্থকেরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে রয়েছে, তা তাদের একেবারে স্পর্শ করতে পারে না। বারবার এ হাওয়া এসে তাদের স্পর্শ করে, তাদের কলুষিত করার চেষ্টা করে, তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাবার চেষ্টা করে। বারবার আমরা নিরলসভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নৈতিকভাবে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছি। কারণ, একটা কথা আমি বিশ্বাস করি এবং আপনাদেরও ভাবতে বলি, আদর্শের কথা যদি ঠিকও হয়, বড়ও হয়, সত্যও হয়, রাস্তাও যদি ঠিক বাতলাতে পারি, তবুও নৈতিক বল এবং উন্নত সাংস্কৃতিক মান ছাড়া সেই রাস্তায় এগোবার শক্তি কোনও মানুষ অর্জন করতে পারে না। একটা বড় আদর্শ, উন্নত আদর্শ এবং সমস্যা সমাধানের সঠিক রাস্তাও যদি কতকগুলো নৈতিক অধঃপতিত মানুষের হাতে পড়ে, তবে তার দ্বারা দেশের মঙ্গল হতে পারে না, আন্দোলনও সফল হতে পারে না। বরং ক্ষতি হয়। তাই আমি বিশ্বাস করি, যে কোনও আদর্শ, তা শুনতে কেমন, বলতে কেমন, স্লোগান কেমন— এ তার বাইরের ঠাট-বাট। কেউ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে, বিপ্লবের কথা বলে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বক্তৃতা করে, কিন্তু তাদের সেই আদর্শের দ্বারা সমাজ অভ্যন্তরে পচে-যাওয়া অধঃপতিত নৈতিক মানকে সংযত করা যায় কি না, উন্নত করা যায় কি না, নূতন নৈতিক বলের সৃষ্টি করা যায় কি না এবং তা সৃষ্টি হচ্ছে কি না, এটাই বিচার্য বিষয়। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, শুনতে, বলতে আদর্শ যত ভালই মনে হোক, সেই আদর্শের আসল মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সাংস্কৃতিক-নৈতিক মানের উপর। এইখানেই তার অগ্নিপরীক্ষা।

কোনও আদর্শ শুনতে এবং বলতে যত ভালই হোক, সে আদর্শের কাঠামো যত সুন্দর হোক, সেই আদর্শের প্রচার এবং প্রভাব সৃষ্টির দ্বারা সমাজ অভ্যন্তরে উন্নত একটা নৈতিক চেতনা, একটা নতুন মান, একটা উন্নত সাংস্কৃতিক ধারণা গড়ে না উঠলে সে আদর্শ কখনও মানুষকে পথ দেখাতে পারে না। তা পরিত্যাজ্য, তা মৃত দেহের মতো পরিত্যাগ করতে হবে। একটা সুন্দর শরীর যদি মৃত ব্যক্তির হয়, আমরা তাকে ফেলে দিই। কেন? কারণ, মমতা করে তাকে জিইয়ে রাখলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। তেমনই একগাদা লোক, যদি নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত ও স্লোগান সর্বস্ব হয়, দাবি তোলে, কিন্তু দায়িত্ব পালন করে না এমন হয়, তা হলে তারা সমাজের অনিষ্ট করবে। লেনিন বলেছিলেন, 'Better fewer, but better'— অর্থাৎ অল্প হোক, কিন্তু উন্নত গুণসম্পন্ন মানুষ চাই, কারণ তারা কিছু করবে।

উন্নত নৈতিক মান ও সঠিক রাস্তায় লড়াই চাই ঃ নির্বাচিত রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড

দুর্নীতি ঢাকতেই যোগ্য তালিকা নিয়ে টালবাহানা সরকারের

আর জি করের ঘটনার পর ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি হারানোর মধ্য দিয়ে আরও একবার পরিষ্কার হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে সরকারি মদতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি কোন গভীর স্তরে পৌঁছেছে! অথচ এই ঘটনায় যাদের সবচেয়ে বেশি লজ্জিত হওয়ার কথা, সেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের নেতা মন্ত্রীদের এ নিয়ে কোনও লজ্জাবোধ আছে বলে তাঁদের বিবৃতি এবং আচরণে বোঝা যাচ্ছে না! চাকরিহারা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা সল্ট লেকের এসএসসি দপ্তর এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে একটানা অবস্থান চালিয়েছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে মধ্য শিক্ষাপর্ষদের আলোচনার ভিত্তিতে আপাতত যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়া এবং বেতন পাওয়ার রায়কে তুলে ধরেই মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী বলে চলেছেন— আপনারা রাস্তায় কেন, স্কুলে চলে যান। অথচ কারা স্কুলে যাবার যোগ্য বলে বিবেচিত এবং কারা অযোগ্য সেই তালিকাটা না দিলে শিক্ষকরা যাবেন কিসের ভিত্তিতে? সেই তালিকাটা দিতেও তারা বহু টালবাহানার পর অবশেষে একটা তালিকা পাঠিয়েছেন স্কুলে স্কুলে। কিন্তু তা নিয়েও নানা সংশয়। মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুরে বসে বলে দিলেন, আমি এক মিনিটে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি। আশ্চর্যের বিষয় হল, তা হলে তিনি তাঁর সরকারের শিক্ষা দপ্তরকে দু-বছর আগেই তো নির্দেশ দিতে পারতেন, আসল ওএমআর সিটগুলো প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত যোগ্যদের চাকরি নিশ্চিত করতে। বলতে পারতেন, যারা টাকার বিনিময়ে চাকরি বেচেছে এবং যারা তা কিনেছে তাদের কড়া শাস্তির পথে তৃণমূল দল এবং তার সরকার বাধা দেবে না।

এই দুটি কাজ করলে তো এই সমস্যা তৈরিই হত না! কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তখন কী করেছেন? শুধু চুপ করে থেকেছেন তাই নয়, দুর্নীতি ঢাকার সব রকম ষড়যন্ত্র চলতে দিয়েছেন। তাঁর দলের একেবারে উঁচু থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে। শুধু স্কুলের চাকরি বেচা তো নয়, সরকারি কাজের এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে এই দুর্নীতি শিকড় গাড়েনি! আর জি করের ঘটনায় দুর্নীতি এবং তাকে ঘিরে ক্রিমিনাল চক্রের ভয়াবহ চিত্র রাজ্যের মানুষ দেখেছে। যে দুর্নীতির কথা নবান্ন সভাঘরে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে সরাসরি তুলে ধরেছিলেন জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের নেতা অনিকেত মাহাতো। মুখ্যমন্ত্রী সেদিনও তাকে ঢাকতে দুর্নীতিবাজ এবং থ্রেট কালচারের নায়কদের রক্ষা করতেই সচেষ্ট হয়েছিলেন। কেন? আজ তাঁর বলা 'একটা মিনিট' যে হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না কি? এখন তাঁদের কাজ ছিল আর ক্ষতি বাড়তে না দিয়ে যোগ্যদের তালিকা দ্রুত প্রকাশ করে দেওয়া। দুর্নীতির কালি লাগা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চিহ্নিত করে নিজের দলের দুর্নীতিবাজদের স্বরূপ ফাঁস করে দেওয়া ও দুর্নীতির দায় শিরোধার্য করে নিঃশর্তে জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

অন্য দিকে স্কুল শিক্ষার এই লণ্ডভণ্ড পরিস্থিতির সুযোগে রাজ্যের সরকারি গদি দখলের প্রত্যাশী বিজেপি এবং সিপিএম নেতৃত্ব যোগ্যদের পক্ষে এখন খুব গলা ফাটালেও তারা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে কী ভূমিকা নিয়েছে? বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত সিবিআই এবং ইডি শিক্ষা দুর্নীতির তদন্তে প্রচুর কালক্ষেপ করলেও তাদের পদক্ষেপ থেকেছে কেন্দ্রীয় শাসক দলের নির্দেশমাফিক। দুর্নীতি ধরবার জন্য সচেষ্ট হলে দেশের সর্বোচ্চ তদন্ত সংস্থা অযোগ্যদের চিহ্নিত করতে পারত না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওএমআর শিটের প্রতিলিপি খুঁজে বার করা, ধৃতদের থেকে তথ্য বার করে দুর্নীতির মূলে পৌঁছানোর কোনও ইচ্ছাই সিবিআই দেখায়নি। সিবিআই যে কেন্দ্রীয় সরকারের পোষা খাঁচার তোতা, এই কথা তো সুপ্রিম কোর্টই বার বার বলেছে। সিবিআই একই ভূমিকা নিয়েছে আর জি কর মামলার ক্ষেত্রে। দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছানোর, এই চক্রকে ভাঙার কোনও চেষ্টাই তারা করেনি। আর জি করের ঘটনায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট আজও পেশ হয়নি। বিজেপির হয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা— এই দুর্নীতি শুরুর কালে ছিলেন তৃণমূলের অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁর দায়িত্বে থাকা জেলাগুলোতে চাকরি দুর্নীতি ব্যাপক বলে দেখা যাচ্ছে। তিনি কি কিছুই জানতেন না? বিজেপি নেতারা তাঁকে একবার প্রশ্ন করে দেখতে পারতেন! তাদের বর্তমান সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতি প্রথমে ৬ হাজারের মতো সন্দেহজনক চাকরির কথা বললেও পরে বিচার ছেড়ে নেমে পড়লেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে নিজের সংসদীয় আখের গোছাতে। বিজেপিও তদন্ত এবং বিচারের কথা শিকেয় তুলে একটা এমপি বাড়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর সিপিএম সাংসদ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই 'অল ফ্রড' তত্ত্বে অনড় ছিলেন। যোগ্য অযোগ্য আলাদা করার চেষ্টারই বিরোধিতা করেছেন তিনি। তাঁর দলও ভেবেছে চরম অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারলে ভোটের বাজারে তাদের লাভ হবে। যদিও এখন সেই দলের নেতা-নেত্রীরা 'যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানো'র কথা বলে চাকরিহারাদের অবস্থানে পৌঁছে টিভিতে মুখ দেখাতে ছুটছেন। অবশেষে আদালতও সিবিআই, এসএসসি এবং রাজ্য সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে বাধ্য করার বদলে 'পিটুনি কর'-এর কায়দায় সব শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদেরই চাকরি বাতিল করে দিয়েছে। দাঁড়াল যা, যোগ্যদেরও আবার পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। দুর্নীতিবাজ নেতা-মন্ত্রীদের গায়ে আঁচড়ও পড়বে না। শাসক দলগুলির দুটি স্বার্থ এখানে কাজ করেছে। প্রথমত তারা সকলেই যখন যেখানে ক্ষমতায় থাকে সেখানেই দুর্নীতির সাথে জড়ায়। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট থেকে দুর্নীতির জন্ম হয়, যে দল সেই ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে কাজ করে তারা দুর্নীতিতে জড়াতে বাধ্য। বিজেপি জানে সিবিআই বেশি দূর পর্যন্ত তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে এগোলে বিজেপির নিট পরীক্ষার দুর্নীতি, ব্যাপম দুর্নীতি নিয়ে জনমানসে নাড়াচাড়া হবে। উত্তরপ্রদেশে ২০১৯-এ ৬৯ হাজার শিক্ষকের

চারের পাতায় দেখুন

এর পরেও তেল কমালে মিড ডে মিলের
পাতে পড়ে থাকবে শুধুই অপুষ্টি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের স্কুল পড়ুয়াদের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে ভয়ানক চিন্তিত! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাকি অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগছে। তাই তিনি পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে তেলের পরিমাণ কমাতে বলেছেন। তেলের ব্যবহার কমাতে সেঁকা (গ্রিলড), সেদ্ধ খাবারের উপদেশও দিয়েছেন। সাথে সাথে তাঁর অনুগত শিক্ষামন্ত্রক ফরমান জারি করেছে, মিড ডে মিলে ভোজ্য তেলের পরিমাণ দশ শতাংশ কমাতে হবে।

শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। প্রধানমন্ত্রী সত্যি এ দেশেরই মানুষ তো? ওজন বাড়ার সমস্যা মূলত যেখানে, সেই উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোটদের জীবনযাত্রার সাথে দেশের শহরে-গ্রামে হাজার হাজার সরকারি স্কুলে পড়তে আসা পড়ুয়াদের জীবনের যে আসমান-জমিন ফারাক, এ কি তিনি সত্যিই জানেন না? এমনিতেও ছোটদের ওজন বাড়লে তা কমানোর জন্য বিশেষজ্ঞরা ব্যায়াম, জাঙ্ক ফুড খাওয়া কমানোর কথা বলেন। অন্য খাদ্য উপাদানের মতোই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে তেলও ছোটদের খাবারে থাকা প্রয়োজন। আর যে শিশুদের ওজন বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত বাড়ছে, তাদের বেশিরভাগই যে সরকারি স্কুলের মিড ডে মিলের ওপর নির্ভরশীল নয়, এটাও জানা কথা। তাহলে হঠাৎ সব ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী মিড ডে মিল রান্নায় তেল নিয়ে পড়লেন কেন?

কী থাকে মিড ডে মিলে? ট্যালটেলে ডাল, একটু আলুমাখা, গরম পড়লে যা থেকে প্রায়ই ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়। কোনও কোনও দিন সয়াবিনের বিস্বাদ ঝোল বা জলের মতো ঘুগনি আর সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন ডিমসেদ্ধ। এ রাজ্যে সম্প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ডিম দেওয়ার কথা বলা হলেও সর্বত্র তা জুটছে কিনা, জুটলেও কতদিন জুটবে সরকারি কর্তারাই বলতে পারবেন। কারা খায় মিড ডে মিল? বহু ঢাকঢোল বাজিয়ে এই প্রকল্প ঘোষণা হয়েছিল তাদের জন্য, বাড়িতে যাদের পুষ্টিকর খাবার জোটে না— সেই সব দরিদ্র, নাচার পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাতে পেটভরা খাবারের টানে অন্তত স্কুলমুখী হয় এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়, এই ছিল ঘোষিত উদ্দেশ্য। দেশের অধিকাংশ সরকারি স্কুলে এই অতি-দরিদ্র, দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই আজও মিড ডে মিলের লাইনে দাঁড়ায় থালা-বাটি হাতে। একটা গোটা ডিম পেলে মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার কখনও কখনও বকুনি খায় মিড ডে মিলের ভাত ফেলে-ছড়িয়ে খাওয়ার জন্য।

বকতে গিয়ে শিক্ষকদেরও থমকে যেতে হয়, কারণ ছোটদের সত্যিই পুষ্টি এবং পেট ভরে খাওয়ার আনন্দ দিতে গেলে খাবারের যেটুকু গুণমান থাকা প্রয়োজন, এই খাবারে তা যে নেই সে কথা তাঁরাও জানেন। থাকার উপায়ও নেই, কারণ এই মুহূর্তে প্রাথমিক স্তরে মাথা পিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ১৯ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৯ টাকা ২৯ পয়সা। বাজার চলতি তেলের দামের সাথে এই বরাদ্দ তুলনা করলেই বোঝা যায়, পড়ুয়াদের পাতে তেল এমনিতেই নামমাত্র। অগ্নিমূল্য বাজারে এই বিন্দুবৎ বরাদ্দে যে শিশুর পুষ্টির চাহিদা পূরণ হতে পারে না, এ কথা বোঝাও কঠিন নয়। সুতরাং মিড ডে মিলের মেনুতে যতই হিসেব কষে ডাল, প্রোটিন ইত্যাদির কথা বলা হোক, প্রয়োজনের জায়গায় এই প্রকল্প এখন যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারগুলোর দয়ার দান। বাজেটের পর বাজেট আসে। মন্ত্রী, সাংসদদের বেতন বাড়ে, সামরিক খাতে খরচ বাড়ে, শিল্পপতিদের জন্য কর ছাড়ের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু পেট ভরে খাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা ওই কচিমুখগুলোর পাতে বরাদ্দ বাড়ে না, বাড়ে না মিড ডে মিল কর্মীদের যৎসামান্য বেতন। সমালোচনা হলে কেন্দ্র, রাজ্য পরস্পরকে দোষারোপ করে দায়িত্ব সারে।

প্রধানমন্ত্রী অতিরিক্ত ওজনের তথ্য দেখানোর সময় ভুলে গেছেন, অন্য তথ্যও আছে। সে তথ্য বলছে, বিশ্বের অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের ৬৫ শতাংশ আছে ভারতে, অপুষ্ট শিশুর সংখ্যার নিরিখে এশিয়ায় তিন নম্বরে আছে আমাদের দেশ। এই যখন অবস্থা, তখন মিড ডে মিলে বরাদ্দ বাড়ানো এবং পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার বদলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে মিড ডে মিলে আরও তেল কমানোর উপদেশ মনে করিয়ে দেয় ফ্রান্সের রানির সেই কদর্য উক্তি— 'ওরা রুটি খেতে না পেলে কেক খায় না কেন?'

যে মেয়েটি স্কুলের ফি দিতে না পেরে চিরকালের মতো শিক্ষার পরিসর থেকে সরে যায়, যে ছেলেটি স্কুল ছেড়ে পরিবারের ভাত জোটাতে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে শ্রম দিতে যায়, সংসারের ভার একটু কমাতে যে নাবালিকাকে মা-বাবা স্কুল ছাড়িয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেন, মিড ডে মিল তাদেরই প্রয়োজন। আর তাদের জন্য এই ছ-সাত টাকা ভিক্ষার বরাদ্দ রেখে 'গ্রিলড' খাবারের উল্লেখ করাও জঘন্য অপরাধ।

এই অপরাধটি নরেন্দ্র মোদি নিছক অজ্ঞতা থেকে করে ফেললেন, এমন ভাবলে বিরাট ভুল হবে। আসলে মুখে যাই বলুন, তিনি এবং তাঁর দল যে গত দশ বছরে মানুষের জীবনের মৌলিক কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারেননি, তা নিজেরা ভাল করেই জানেন। বেকারি, দারিদ্র, অশিক্ষা, অপুষ্টি, নারী নির্যাতন— সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে, দেশের মানুষের মনে জমা হচ্ছে ক্ষোভের পাহাড়। সেই ক্ষোভ চাপা দিতে রুজি-রুটির সমস্যা থেকে নজর ঘোরানোর জন্য কখনও কুৎসিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, কখনও এরকম সস্তা চমকই তাদের শেষ অস্ত্র।

বছর দুই আগে মিড ডে মিল প্রকল্পের গালভরা নাম রাখা হয়েছিল 'প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ'। মোদিজির এই অসংবেদনশীল মন্তব্য প্রমাণ করল, বিজেপি সরকারের অন্যান্য বহু প্রকল্পের মতোই প্রধানমন্ত্রীর নামমাহাত্ম্য প্রচারই এর মূল উদ্দেশ্য। দেশের কোটি কোটি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর জীবনে ওই পোষণ, শক্তি, নির্মাণের মতো শব্দগুলোর কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

দার্জিলিং জেলা রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের একটি মূল্যবান আলোচনা 'লেনিনের কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষা, সংশোধনবাদের বিপদ ও ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি' বইটির উপর নানা প্রশ্নের ভিত্তিতে ১৩ এপ্রিল দার্জিলিং জেলায় রাজনৈতিক ক্লাস হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল ও রাজ্য কমিটির সদস্য দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য।

এআইডিএসও-র বিহার রাজ্য সম্মেলন

বিহার রাজ্যের নবম ছাত্র সম্মেলন দ্বারভাঙা শহরে অনুষ্ঠিত হল ১২-১৩ এপ্রিল। সম্মেলনের সূচনায় এক বিশাল ছাত্র মিছিল ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে শুরু হয়ে দ্বারভাঙা শহর পরিক্রমা করে। ১৩ এপ্রিল শিক্ষা সেমিনার ও প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে দেশ এবং বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন এমএলএসএম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ অমরকান্ত কুমার, এআইডিএসও-র সেন্ট্রাল কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি কমরেড সমর মাহাতো এবং বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিজয় কুমার। প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছাত্র প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি ও এস ইউ সি আই (সি)-র বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ কুমার সিং, সংগঠনের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবাশীষ প্রহরাজ ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। বামপন্থী ছাত্র ঐক্যকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্য সম্মেলনে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে এআইএসএ, এআইএসএফ, এসএফআই-এর মতো বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির নেতারা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে ৪২ সদস্য বিশিষ্ট বিহার রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। কমরেড বিজয় কুমার সভাপতি, কমরেডস শিব কুমার এবং রাজু কুমার সহ সভাপতি, কমরেড পবন কুমার সম্পাদক, কমরেড শিমলা মৌর্য অফিস সম্পাদক এবং কমরেড আদিত্য কুমার কোষাধ্যক্ষ রূপে নির্বাচিত হন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড রওশন কুমার রবি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিহার রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সভাপতি কমরেড সাধনা মিশ্র এবং সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট বিজয় কুমার মণ্ডল।

টালবাহানা সরকারের

তিনের পাতার পর

চাকরি বাতিল নিয়ে কথা উঠবে। সিপিএম জানে এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে তাদের আমলে টাকার বিনিময়ে চাকরি, দলবাজি-স্বজনপোষণ নিয়ে নাড়াচাড়া হবে। ২০১২ তে হাইকোর্টের রায়ে ২২০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের প্রশ্ন উঠবে। ত্রিপুরায় ১০ হাজারের বেশি শিক্ষকের চাকরি বাতিল নিয়ে টানাটানি হবে। ফলে এরা কেউই আরজিকর নিয়ে যেমন সত্য উদঘাটনের দাবিতে বেশিদূর যেতে চায়নি। শিক্ষকদের প্রশ্নেও তাই। যতটা করলে তাদের ভোট প্রচারের সুবিধা হবে, দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতিতে সুবিধা হবে, তার বেশি তারা আন্দোলনকে এগোতে দেবে না।

অত্যন্ত স্বস্তির কথা যে, জনগণ এই সব ভোটবাজ দলগুলির নেতা-নেত্রীদের কথায় বিশ্বাস করেন না। তাই এই সব দলগুলি যখন আর জি কর আন্দোলনকে ভোট-রাজনীতির রাস্তায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল, জনগণ তাতে সায় দেননি। তাঁরা আন্দোলনের রাস্তাতেই দৃঢ়পণ ছিলেন। এবারও শিক্ষকদের আন্দোলনে জনসাধারণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রশাসন যখন খাবার জল, মহিলাদের জন্য শৌচাগারের সুযোগটুকুও দিতে রাজি হয়নি, তখন স্থানীয় নাগরিকরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যে কোনও আন্দোলনে এই সচেতন জনগণই সবচেয়ে বড় ভরসা।

এ ক্ষেত্রে আর জি কর আন্দোলন শিখিয়েছে, দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে গণকমিটির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলাটাই রাস্তা। নিছক ভোটের খোয়াব দেখানো নয়, এই গণকমিটির ভিত্তিতে আন্দোলনই পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চাই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

একের পাতার পর

পাশেই বুকস্টলে ছিল উপচে পড়া ভিড়। মঞ্চে দলের সঙ্গীত গোষ্ঠী একের পর এক গণসঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছেন। শুরু হল কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের অনুষ্ঠান। কমরেড প্রভাস ঘোষের পর প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এবং সভার সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। প্যারেড করে এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে গার্ড অফ অনার জানাল দলের কিশোরবাহিনী কমসোমল। শুরু হল সভার মূল কাজ।

সভাপতির উত্থাপিত প্রস্তাবে উঠে এল কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা, প্যালেস্টাইনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলের আক্রমণ ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ। অভয়া হত্যাকাণ্ডে যুক্ত দোষীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তি, যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফেরানো ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তির দাবি করা হয়েছে প্রস্তাবে। ওয়াকফ সংশোধনীর নিন্দা করে ও মুর্শিদাবাদে দাঙ্গার জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে প্রস্তাবে জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় প্রস্তাব। কাশ্মীরের পহলগামে নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য শুরু করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। বলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনা কাশ্মীর সহ গোটা দেশের প্রবল ক্ষতি করল। এ ঘটনায় শুধু প্রাণহানি হল তাই নয়, কাশ্মীরের পর্যটন শিল্প সহ গোটা অর্থনীতি বিপদগ্রস্ত হল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে কাশ্মীরকে সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী দিয়ে মুড়ে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেখানে পহলগামে কী করে এই ঘটনা ঘটতে পারল, তার জবাব দিতে হবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেই। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এরপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কাশ্মীরে সেনা তৎপরতা আরও বাড়াবে, কাশ্মীরের নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার বাড়বে। এমনিতেই শাসক দল বিজেপি দেশে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছে। পহলগামের এই ঘটনাকে তারা সেই কাজেই ব্যবহার করবে। অথচ এ দিন সন্ত্রাসীদের হাত থেকে হিন্দু পর্যটকদের বাঁচাতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন এক গরিব মুসলমান যুবক। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছবার আগে দীর্ঘ সময় ধরে আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন স্থানীয় কাশ্মীরী মানুষ, ধর্মে যাঁরা মুসলমান। ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি পহলগামের ঘটনা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার যে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে, তা থেকে সাবধান থাকার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান কমরেড প্রভাস ঘোষ।

তিনি বলেন, দেশ জুড়ে ধর্মের রাজনীতি চলছে। শুধু বিজেপি নয়, রাজ্যে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসও এ বিষয়ে বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক ধর্মীয় অশান্তির উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে পুলিশকে সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে নিষ্ক্রিয় রেখে দাঙ্গা চলতে দেওয়া হয়েছে। এ ভাবে তারা মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক সংহত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আবার তারা হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের জন্য মন্দির নিয়ে মাতছে, বিজেপির সঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। এ সবই চলছে ভোটের লক্ষ্যে। ক্ষমতালোভী, নীতিহীন রাজনৈতিক নেতারাই এখন ধর্মপ্রচারক। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসাহদান, ক্লাবগুলিকে দেদার টাকাপয়সা দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তারা কার্যত ভোটের জন্য বিনিয়োগ করছে।

মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

দেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আপসমুখী নেতৃত্বের কারণে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নবজাগরণের মনীষীদের সেকুলার মানবতাবাদী আদর্শের পথ ধরে পরিচালিত হতে পারেনি এ দেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন। কংগ্রেস হয়ে পড়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতাদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন। ফলে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দেশের দলিত সমাজ, মুসলমান ধর্মের মানুষ অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আজও এর খেসারত দিয়ে চলেছি আমরা।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করছেন না। সমস্ত সরকারি দল দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হল আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক-ছাত্রী অভয়াকে। আজও সেই ঘটনার ন্যায়বিচার মেলেনি। কিন্তু তাতে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের মানুষ যে ভাবে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ভয়াবহ দুর্নীতির ছবি সামনে এসেছে। সরকার বাধ্য হয়েছে অভিযুক্তদের গ্রেফতার সহ অনেকগুলি পদক্ষেপ নিতে। শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির মাশুল দিয়ে আজ হাজার হাজার চাকরিহারা শিক্ষক আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছেন। শিক্ষকের অভাবে এমনিতেই রাজ্যের ধুঁকতে থাকা স্কুলগুলি ভয়ানক দুর্বিপাকে পড়েছে। কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি এখন সিবিআই, ইডি-র মতো সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের শায়েস্তা করতে কাজে লাগাচ্ছে। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির দুর্নীতি নিয়ে তাদের মুখে কুলুপ।

গভীর মনোযোগে

কমরেড প্রভাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এই অসহনীয় পরিস্থিতির মূল উৎস পচা গলা দুর্গন্ধময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে এই পুঁজিবাদ খেটে-খাওয়া মানুষের উপর শোষণ-উৎপীড়ন ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। নীতি-আদর্শ কোনও কিছুরই ধার ধারে না অবক্ষয়ী এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থারই সেবাদাসত্ব করে চলেছে শাসক রাজনৈতিক দলগুলি।

দেশের ভয়ঙ্কর আর্থিক বৈষম্যের চেহারা তাঁর ভাষণে তুলে ধরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ দখল করে রেখেছে দেশের মোট সম্পদের ৭৭ শতাংশ। অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব ৬৭ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ। প্রতিদিন অসংখ্য শিশু অনাহারে মারা যায়। কোটি কোটি বেকার, ছাঁটাই শ্রমিক। স্থায়ী কাজের ধারণা বাস্তবে উঠে গেছে। পেটের দায়ে ঘর ছেড়ে অন্য রাজ্যে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে পাড়ি দিচ্ছেন লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। গিগ শ্রমিকদের দুর্দশা অবর্ণনীয়।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি দেখান, আরএসএস-বিজেপিকে মানার অর্থ, বিবেকানন্দের শিক্ষা অমান্য করা, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-নবজাগরণের মনীষীদের চেতনাকে নস্যাৎ করা। ইতিহাস উল্লেখ করে তিনি দেখান আরএসএস চিরদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। তাদের চোখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামরা দেশপ্রেমিক নন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, গোটা বিশ্বের অর্থনীতিই আজ ধসে পড়তে চলেছে। আমেরিকা সহ ধনী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনীতি আজ অস্ত্র ব্যবসা ছাড়া অচল। তাই অবলীলায় প্যালেস্টাইনকে ধ্বংস করে সেখানে বিনোদনের জায়গা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। অথচ বিশ্বে কোথাও প্রতিবাদ নেই। বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে আজ জনগণকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।

তিনি বলেন, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে চাই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রতিটি দেশে জনজীবনের সমস্যা সমাধানের দাবিতে এই বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে এগিয়ে চলতে হবে। জনগণকে সক্রিয় করে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হবে অজস্র গণকমিটি। বামপন্থী দল হিসাবে সিপিআইএম-এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এদের প্রতি আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। এস ইউ সি আই (সি) চায় সিপিআইএম আন্দোলনে আসুক। কিন্তু তার আগে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ্যে তাদের ভুল স্বীকার করতে হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করেছে, টাডা, মিসা, আফস্পার মতো আইন চালু করেছে, অজস্র দাঙ্গা বাধিয়েছে, তাকে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাজিয়ে তার সঙ্গে জোট গড়ে তোলা কি সুবিধাবাদী আচরণ নয়? এই আচরণ ত্যাগ করে সত্যিকারের আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য সিপিএম-এর কর্মী-সমর্থকদের কাছে আহ্বান জানান তিনি।

উপস্থিত জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আপনাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজনীতি বুঝতে হবে। কারণ, আপনাদের

আটের পাতায় দেখুন

উদ্ধৃতি প্রদর্শনী উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু

কেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে বিপর্যস্ত হল

একের পাতার পর

সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর সময় লেগেছে। এই প্রক্রিয়াটির শুরু নবজাগরণের সূচনাপর্ব থেকে। মার্ক্সবাদ তথা সাম্যবাদ হল একটি নতুন মতাদর্শ। এই মতাদর্শ দাসপ্রথা থেকে শুরু করে পুঁজিবাদ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকা শ্রেণি শোষণের নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করছে। এর আগে যতবার সমাজ পাল্টেছে প্রতিবারই এক ধরনের শ্রেণি শোষণের জায়গায় নতুন ধরনের শ্রেণি শোষণ এসেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ছিল চিরতরে শ্রেণি শোষণের অবসান ঘটানো। বলিষ্ঠ সংগ্রাম চালিয়ে সমস্ত আক্রমণ, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে, সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে হাজার হাজার বছরের শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে সত্তর বছর ধরে লড়াই করেছে সমাজতন্ত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীরা নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তার জন্য কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সমাজতন্ত্রের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই?

এখানে উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, মার্ক্সবাদীরা কখনও এমন দাবি করেনি যে, একবার সমাজতন্ত্র অর্জিত হলে পুঁজিবাদের আর ফিরে আসার কোনও আশঙ্কা নেই। বরং তারা বারবার সেই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মার্ক্স যেমন বলেছেন, "এখানে আমাদের যে সাম্যবাদী সমাজটিকে পরিচালনা করতে হবে, তা নিজের ভিত্তির উপর বিকশিত নয়। বরং তার বিপরীতে যেহেতু এই সমাজ পুঁজিবাদী সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই এই সমাজের অর্থনৈতিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক সহ সমস্ত ক্ষেত্রে সেই পুরনো সমাজের জন্মচিহ্ন (Birthmark) থাকবে যার গর্ভ থেকে তার উদ্ভব ঘটেছে"[১]। তিনি আরও বলেছেন, "... সাম্যবাদী সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে ব্যক্তির শ্রমবিভাগের দাসত্ব থেকে মুক্তির পর, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যখন মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে, শ্রম যখন বেঁচে থাকার উপায় নয়, বরং জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠবে, ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদিকা শক্তিগুলিও যখন বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজের সম্পদের বারিধারা যখন আরও অফুরান স্রোতে বইতে থাকবে— একমাত্র তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ গণ্ডি সম্পূর্ণ রূপে অতিক্রম করা যাবে এবং সেই সমাজের পতাকায় খোদাই করা থাকবে এই কথা— প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী (শ্রম নেওয়া হবে) এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী (পাবে)"[২]। অর্থাৎ মার্ক্সের মতে, "সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত 'বুর্জোয়া অধিকার'গুলির সংকীর্ণ গণ্ডিবহাল থাকবে। এর অর্থ হল, পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিপদ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে 'বুর্জোয়া অধিকার'-এর আকাঙ্ক্ষা থেকে যাবে। এ সম্পর্কে লেনিনও সতর্ক করে বলেছেন, "সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব মানে হল, অধিকতর শক্তিধর শত্রু বুর্জোয়া শ্রেণি, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর (এমনকি একটিমাত্র দেশে হলেও) যাদের প্রতিরোধশক্তি দশগুণ বেড়ে যায় এবং যাদের শক্তি শুধু আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তির মধ্যে, তাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগগুলির শক্তি ও স্থায়িত্বের মধ্যে নিহিত থাকে না, নিহিত থাকে অভ্যাসের শক্তি, ছোট উৎপাদনক্ষেত্রগুলির শক্তির মধ্যে— তাদের বিরুদ্ধে নতুন (সর্বহারা) শ্রেণির সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠোর ও আপসহীন সংগ্রাম"[৩]।

এ বার আমি রাশিয়া এবং চিন, এই দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয় যা ওই দেশগুলির প্রতিবিপ্লবকে তরান্বিত করেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করব। এই বিষয়ে আমি বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক এবং এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন উল্লেখ করতে চাই। ১৯৪৮ সালে, যে সময়টায় সারা বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন দৃঢ় প্রত্যয়ে এগোচ্ছে, সেই সময় শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রযাত্রার প্রশংসা করে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, "...বিশ্ব কমিউনিস্ট শিবিরের বর্তমান নেতৃত্ব অনেকাংশে যান্ত্রিক চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। ... এই কারণে মার্ক্সবাদী দ্বান্দ্বিক নীতি লংঘিত হয়ে চলেছে। ... বেশিরভাগ দলই যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সহজ পথ বেছে নিয়েছে। যার ফলে শীর্ষ নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে"[৪]। উপযুক্ত আদর্শগত মান এবং সর্বহারা সংস্কৃতির অভাবের কারণেই এটি ঘটেছিল।

এ ছাড়া, তিনি দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক কাঠামোর বেশিরভাগটাই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দর্শন, মতাদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, পারিবারিক সম্পর্ক, প্রেম ও স্নেহ, অভ্যাসের শক্তি ইত্যাদির মতো পুরনো উপরিকাঠামোর বিভিন্ন দিকেরও পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। কিন্তু অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পরিবর্তন আপনাআপনি ঘটে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপূরক করে উপরিকাঠামোয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য আদর্শগত-সাংস্কৃতিক-নৈতিক ক্ষেত্রে পৃথক ও সর্বাত্মক তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের প্রয়োজন, যা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ। তা না হলে উপরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শক্তিগুলির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিকে আক্রমণ ও তা ধ্বংস করে দেওয়ার বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়।

তিনি আরও যে বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন তা হল বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ। এই 'ব্যক্তিবাদ' ইতিহাসে এমন এক সময়ে এসেছিল যখন উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছিল। সুতরাং, 'ব্যক্তি অধিকার', 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' ইত্যাদি ধারণা সেই সময়ে সমাজপ্রগতির সূচক ছিল। কিন্তু মজুরি শ্রমের (wage labour) শোষণের মাধ্যমে উৎপাদনের উপর পুঁজিবাদী মালিকানা প্রতিষ্ঠার পর এই ধারণাগুলিই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে যা আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের প্রতি উদাসীন মনোভাবের জন্ম দেয়।

রাষ্ট্রক্ষমতা যেহেতু বুর্জোয়াদের দখলে ছিল, তাই রুশ বিপ্লব ছিল পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং লেনিনের মতে, 'সেই অর্থে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছিল'। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যান্য দিক যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদির পরিবর্তন অপূরিত থেকে যায়। চিন বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে মূলত একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল। ব্যক্তিবাদ দুটি বিপ্লবেই খানিকটা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল, যেমন করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনে।

ফলে, রাশিয়া এবং চিন উভয় বিপ্লবের সময়েই নৈতিকতার ধারণা ছিল— 'বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য' এবং 'ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ'। বিপ্লবের পরে এবং অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধির পরে সেই ব্যক্তিস্বার্থ 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদে' পরিণত হয়। শিবদাস ঘোষ বলেছেন, '...সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই ব্যক্তিবাদ যদিও চরিত্রের দিক দিয়ে মূলত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদই, তবুও এর রূপ ও ধরন-ধারণ বিপ্লব-পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের সাথে অভিন্ন নয়। উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার জন্য, আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবাদের এই রূপটিকে 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলি। মনে রাখতে হবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে থেকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ খতম হয়ে যায় না'[৫]। কমিউনিস্ট নৈতিকতার নতুন ধারণা গড়ে তুলে, অর্থাৎ ব্যক্তিবাদের শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে ব্যক্তিস্বার্থকে সমাজ, বিপ্লব এবং বিপ্লবী দলের স্বার্থের সাথে একাত্ম করে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যেত। ওই দুটি দেশে এটি করা হয়নি। যদিও জীবনের শেষ পর্যায়ে স্ট্যালিন এই বিপদটি আঁচ করেছিলেন, পরে আমি এ বিষয়ে বলব।

উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। বিপ্লবের সময় ওই সব দেশের মানুষ বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল, কারণ তারা মনে করেছিল, এটি শোষণ, দারিদ্র্য দূর করবে এবং তাদের উন্নত জীবন এনে দেবে। কিন্তু জনসাধারণের সকলেই কমিউনিস্ট ছিলেন না। উভয় দেশেই কমিউনিস্ট নন, এমন মানুষই সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তুলনায়, কমিউনিস্টপার্টির সদস্য অনেক কম ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ আদর্শগতভাবে মার্ক্সবাদী হিসাবে গড়ে ওঠে ততক্ষণ তারা অ-মার্ক্সবাদী চিন্তাভাবনা, অর্থাৎ বুর্জোয়া মতাদর্শ বহন করে চলে এবং এটি জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে একটি পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব তৈরি করে। তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে যদি মানুষকে বুর্জোয়া মতাদর্শ থেকে মুক্ত না করা হয়, তা হলে এটি কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপন্ন করে এবং এর সদস্যদের অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। মানসিক ও শারীরিক শ্রমের মধ্যে একটি বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব ছিল। সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশ যদি কমিউনিস্ট নৈতিকতা অর্জন না করে, তা হলে তারা অহংবোধের শিকার হয় এবং ভাবতে শুরু করে যে কায়িক শ্রমজীবীরা তাদের চেয়ে নিম্নমানের। এই অহংবোধ তাদের সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব গ্রহণ করতে বাধা দেয় এবং তাদের মধ্যে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে।

এ ছাড়া, আদর্শগত মানের নিম্ন মান এবং উন্নত কমিউনিস্ট নৈতিকতার অভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় পরিণত হয়, যার ফলে দল ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা জন্ম নেয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উগ্র গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। তা ছাড়া, যে পুরনো প্রজন্ম জারশাসিত রাশিয়ায় অকথ্য শোষণ-নির্যাতন সহ্য করেছিল এবং বিপ্লবের জন্য লড়াই করেছিল, নবজাত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আগ্রাসন, অর্থনৈতিক অবরোধ ও দেশের ভিতরে প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেই প্রজন্ম আজ আর নেই।

বিপ্লবের কয়েক দশক পরে আসা নতুন প্রজন্ম, যারা উন্নত সমাজতন্ত্রের সমস্ত সুবিধা ও সুফল ভোগ করেছে, তাদের অধিকাংশই কমিউনিস্টআদর্শ ও নৈতিকতার চর্চার অভাবে 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ'-এর শিকার হয়েছে। বিপ্লব-পূর্ব যুগের অসহনীয় যন্ত্রণা এবং বিপ্লবী সংগ্রামে পূর্বতন প্রজন্মের ভূমিকা সম্পর্কে এদের কেবল বই-পড়া ধারণা থাকায় এদের মধ্যে বিপ্লব সম্পর্কে আবেগ ও বিপ্লবী চেতনা আগেকার মতো ছিল না। উপরে উল্লিখিত ঘটনার পাশাপাশি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্র রাশিয়া এবং চিন উভয় দেশেই প্রতিবিপ্লব ঘটিয়েছিল।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে স্ট্যালিন এই বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। অসুস্থ থাকায় সিপিএসইউ-এর ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে তাঁর পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল, সেখানে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে সে আশঙ্কা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি সেই রিপোর্টে বলেছিলেন, "দলের প্রধান কর্তব্য হল আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং এই কাজে অবহেলা করা হলে তা পার্টি এবং রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের সর্বদা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ার অর্থ হল বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব শক্তিশালী হওয়া। ... আমাদের মধ্যে এখনও বুর্জোয়া মতাদর্শ টিকে আছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবশিষ্টাংশ রয়ে গেছে। এগুলি আপনাআপনি ধ্বংস হয়ে যায় না। এগুলি টিকে থাকার খুবই শক্তি রাখে (highly tenacious) এবং নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ সবের বিরুদ্ধে অবশ্যই নিরলস ভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

... বাইরের পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে কিংবা দেশের ভিতরকার সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন গ্রুপগুলি যাদের পার্টি সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি, তাদের থেকে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা, অনুভূতি ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটবে না— আমাদের এমন গ্যারান্টি নেই।"[৬] এটা স্পষ্ট যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপন্নকারী এইসব পুঁজিবাদী শক্তিগুলি থেকে বিপদের আশঙ্কা স্ট্যালিন অনুভব করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার জন্য পার্টিকে প্রস্তুত করছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁর দুঃখজনক মৃত্যু সেই কাজকে ব্যাহত করেছিল।

সাতের পাতায় দেখুন

কেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা

ছয়ের পাতার পর

১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সিপিএসইউ-এর ২০তম কংগ্রেসের ঠিক পরেই শিবদাস ঘোষ সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, "নিঃসন্দেহে ক্রুশ্চেভের এই চিন্তাভাবনা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংস্কারবাদ-সংশোধনবাদের প্রবণতা তৈরি করবে"[৭]। তিনি আরও বলেছিলেন, "স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার অনিবার্য পরিণাম তাঁর অথরিটিকে অস্বীকার করা এবং লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা, যা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আজকের দিনের সঠিক উপলব্ধি, তা প্রত্যাখ্যান করা। ... এর অর্থ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নামে সমস্ত ধরনের প্রতিবিপ্লবী ধ্যান-ধারণাকে আমন্ত্রণ জানানো যার ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের ভিত্তি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে"[৮]।

রেনিগেড ক্রুশ্চেভকে একমাত্র এর জন্য দায়ী করলে চলবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা একটি প্রতিবিপ্লবী ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। দলের সাধারণ সদস্য-কর্মীদের আদর্শগত মান অনুন্নত থাকায় নেতৃত্বকে তারা অন্ধ ভাবে অনুসরণ করতে অভ্যস্ত ছিল। রেনিগেড ক্রুশ্চেভের তোলা 'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম', 'উদারীকরণ', 'সমাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ' ইত্যাদি স্লোগানের পিছনে থাকা ষড়যন্ত্রটি তারা ধরতে পারেনি। চিনেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৬ সালে মাও সে তুং নিজে চিনে প্রতিবিপ্লবের বিপদটি অনুভব করেছিলেন এবং দল ও রাষ্ট্রের মাথায় বসে থাকা 'পুঁজিবাদের পথিক'দের (Capitalist roaders) বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব বুর্জোয়া শক্তিগুলিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৬ সালে মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর 'পুঁজিবাদী পথিক'রা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করে।

যদিও সমাজতন্ত্র ভেঙে গেছে, তবুও মনে রাখা দরকার যে, মানবজাতির ইতিহাসে সমাজতন্ত্র একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। শ্রেণিশোষণহীন এই সভ্যতা সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করেছিল। এই সভ্যতা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা এনেছিল। সকল জাতি ধর্মের মধ্যে সংঘাতের বিলোপ নিশ্চিত করেছিল। সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধানে লিঙ্গ নির্বিশেষে শ্রমিকদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহারের অধিকার ও জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করেছিল। এই সভ্যতা বিশ্বশান্তি এবং সকল ধরনের স্থানীয় ও বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করা এবং সমস্ত অস্ত্র ধ্বংসের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করেছিল। এই কারণেই রোমাঁ রোলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র, ভগৎ সিং প্রমুখ বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই নতুন সভ্যতার প্রশংসা করেছিলেন। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এই সোভিয়েট ইউনিয়নই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানবজাতিকে ফ্যাসিবাদী দেশগুলির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিস্পর্ধী একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যা সমস্ত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সহায়তা করেছিল। যদি আজ সেই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব থাকত, তা হলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক দখল করতে, লিবিয়া ধ্বংস করতে কিংবা প্যালেস্টাইনে আক্রমণে ইজরায়েলকে মদত দেওয়ার সাহস করত না। একই সাথে সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হওয়া রাশিয়া আজ যে ভাবে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা, শত শত শহর ও গ্রাম ধ্বংস এবং অগণিত মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করছে, তা-ও করতে পারত না।

আজ দুটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া চিন, বিশ্ববাজারে আধিপত্য বিস্তার এবং অন্যান্য দেশকে অর্থনৈতিকভাবে লুণ্ঠনের জন্য একে অপরের সাথে প্রবল দ্বন্দ্বে লিপ্ত। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আজ অভূতপূর্ব অনিরসনীয় অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। বাস্তবে তীব্রতর হতে থাকা ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক মন্দা তাদের অর্থনীতিকে ক্রমশ আরও বেশি করে নিমজ্জিত করছে। তাই তারা একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছে। সম্প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য দেশগুলিকে তার নির্দেশের কাছে নতজানু হতে আদেশ করার সাহস দেখিয়েছে। দুটি বিশাল সাম্রাজ্যবাদী দানবের মধ্যে বর্তমান অর্থনৈতিক যুদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে যাবে কি না, ভবিষ্যতই তা বলবে।

তবে সমস্তটাই অন্ধকার নয়। আশার আলোও রয়েছে। জীবনের অসহনীয় তীব্র সমস্যাগুলি জনগণের ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। ঢেউয়ের মতোই এই বিক্ষোভ কখনও উত্তাল হচ্ছে, কখনও তাতে ভাটার টান দেখা যাচ্ছে, আবার তা উত্তাল হয়ে উঠছে, আবার নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে— এ ভাবেই একটানা চলছে। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট', 'আরব বসন্ত', দিল্লিতে বছরব্যাপী কৃষক আন্দোলন, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে ঘন ঘন শ্রমিক ধর্মঘটের মতো আন্দোলনগুলি যে তীব্র আকার ধারণ করেছে, তা আকস্মিক নয়। জনগণ যে প্রতিবাদ চাইছে, জনগণ যে সংগ্রাম চাইছে, জনগণ যে পরিবর্তন চাইছে— এ সবের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে। বিপ্লবের জন্য এটাই বাস্তব শর্ত। কিন্তু জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করবে অর্থাৎ বিপ্লব সংঘটিত করবে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে গড়ে ওঠা এমন যে বিপ্লবী সর্বহারা দল, সেটি এখনও উপযুক্ত ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হয়নি।

সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা এ জন্য তৈরি হয়নি যে মার্ক্স-এঙ্গেলস তা চেয়েছিলেন। পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে অনিরসনীয় দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে উদ্ভূত অনিবার্য এক সামাজিক নিয়মেই এই আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে যাকে মার্ক্স-এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিকভাবে সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছেন। মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ একমাত্র সমাজতন্ত্রের উপরে এবং তার পরবর্তী কালে সাম্যবাদের উপরেই নির্ভর করে আছে। শীঘ্রই হোক বা কিছু বিলম্বে হোক, অনিবার্যভাবেই আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্থান হবে। প্যারি কমিউনের পরাজয় থেকে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেমন শিক্ষা নিয়েছিল, তেমনই প্রতিবিপ্লবকে প্রতিরোধ ও পরাজিত করতে, আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রাশিয়া ও চিনের প্রতিবিপ্লব থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সূত্র ঃ

১ ঃ What we have to deal with here is a communist society, not as it has developed on its own foundations, but, on the contrary, just as it emerges from capitalist society; which is thus in every respect, economically, morally, and intellectually, still stamped with the birthmarks of the old society from whose womb it emerges.ঃ কার্ল মার্ক্স ঃ ক্রিটিক অফ গোথা প্রোগ্রাম

২ ঃ In a higher phase of communist society. after the enslaving subordination of the individual to the division of labor, and therewith also the antithesis between mental and physical labor, has vanished; after labor has become not only a means of life but life's prime want; after the productive forces have also increased with the all-around development of the individual, and all the springs of co-operative wealth flow more abundantly - only then can the narrow horizon of bourgeois right be crossed in its entirety and society inscribe on its banners From each according to his ability, to each according to his needs. ঃ কার্ল মার্ক্স ঃ প্রবন্ধ।

৩ ঃ The dictatorship of the proletariat means a most determined and most ruthless war waged by the new class against a more powerful enemy, the bourgeoisie, whose resistance is increased tenfold by their overthrow (even if only in a single country)—, and whose power lies, not only in the strength of international capital, the strength and durability of their international connections, but also in the force of habit, in the strength of small-scale production. ঃ ভি আই লেনিন ঃ লেফট উইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিজর্ডার

৪ ঃ ... the present leadership of the world communist camp is to a very large extent, influenced by mechanical process of thinking.... because of this there has been continuous violation of the Marxist dialectical principle... most of the parties have chosen the easy way of mechanical centralisation which has led to the formation of bureaucratic leadership at the top. ঃ শিবদাস ঘোষ ঃ কমিউনিস্ট শিবিরের আত্মসমালোচনা, নির্বাচিত রচনা, খণ্ড-১

৫ ঃ Although this individualism in the socialist society is essentially bourgeois individualism, in terms of character, its manifestations and pattern in the post-revolutionary social¬ist society are not, however, identical with bourgeois individualism. To point out the difference between the nature of the two, we call this form of individualism in socialist society 'socialist individualism'. It has to be kept in mind that establishment of the socialist society has not ipso facto put an end to bourgeois individualism within the working class. ঃ শিবদাস ঘোষ ঃ মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান হল বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি, নির্বাচিত রচনা, খণ্ড-৪

৬ ঃ Ideological work is the prime duty of the party and under-estimation of this work may cause irreparable damage to the interest of the party and state. We must always remember that any weakening of the influence of the socialist ideology signifies strengthening of the influence of bourgeois ideology. We still have survivals of the bourgeois ideology, relics of the private property mentality and ethics. These survivals do not die away of themselves.

They are highly tenacious and may strengthen their hold, and resolute struggle must be waged against them. Nor are we guaranteed against the penetration of alien views, ideas and sentiments from outside, from the capitalist countries or from inside, from the remnants of groups hostile to Soviet state which had not been completely demolished by the party. ঃ জে. ভি স্ট্যালিন ঃ সিপিএসইউ-এর ১৯তম পার্টি কংগ্রেসের প্রতিবেদন

৭ ঃ No doubt, this trend of thinking by Khrushchev is sure to generate the trend of reformism-revisionism in the communist movement of different countries. ঃ শিবদাস ঘোষ ঃ সিপিএসইউ-এর ২০তম পার্টি কংগ্রেসের প্রতিবেদন, নির্বাচিত রচনা, খণ্ড-১

৮ ঃ To black out Stalin would have the inevitable result of disowning his authority and consequently of rejecting his interpretation of Leninism, which is the present-day understanding of Marxism-Leninism. It would mean invitation to all sorts of counter-revolutionary ideas to pass for Marxism-Leninism and the ideological foundation of the communist movement would suffer a setback. ঃ শিবদাস ঘোষ ঃ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে, নির্বাচিত রচনা, খণ্ড-১

আশাকর্মী ইউনিয়নের আমতা ব্লক সম্মেলন

হাওড়া জেলায় আমতা-১ ব্লকের আশাকর্মীদের উদ্যোগে ৫ এপ্রিল আমতা শিবতলায় ব্লক সম্মেলন হয়। বক্তা ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ আশাকর্মী ইউনিয়নের সহ সভানেত্রী সুমনা সিংহ রায় ও তহমিনা বেগম। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির সম্পাদক নিখিল বেরা। সম্মেলন থেকে গৌরী খামরুইকে সভানেত্রী, মানসী দেয়াসীকে সম্পাদিকা ও চম্পা প্রধানকে কোষাধ্যক্ষ করে ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 37 Bengali Weekly April 25, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

কোতোয়ালি থানায় ছাত্রীকর্মীদের উপর অত্যাচার
অপরাধ ঢাকতে পুলিশের তথ্যবিকৃতি ধরা পড়ল হাইকোর্টে

মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় এআইডিএসও-র চার ছাত্রীকর্মী সুশ্রীতা সরেন, তনুশ্রী বেজ, রানুশ্রী বেজ ও বর্ণালী নায়কের উপর মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলায় ২২ মার্চের রায়ে প্রথম ধাপের আইনি জয় হল। ছাত্রীদের পক্ষে মামলাটি লড়েন হাইকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সিংহ রায়, কার্তিক কুমার রায়, দেবাশীষ ব্যানার্জি প্রমুখ। ১ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ৩ মার্চ এআইডিএসও-র ডাকা সারা বাংলা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ধর্মঘটে অংশ নেওয়া ওই ছাত্রীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, কোর্টে জমা দেওয়া যে সব তথ্যের ভিত্তিতে সরকারপক্ষ ছাত্রীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল, সেগুলির প্রতি হাইকোর্ট শুধু অবিশ্বাসই ব্যক্ত করেনি, এগুলি যে বানানো ছিল, তাও জানিয়েছে। মামলা চলাকালীন হাইকোর্ট তার অবজারভেশনে বারবার উল্লেখ করেছে যে, পুলিশ অযৌক্তিকভাবে এবং অপ্রয়োজনে ১৬ ঘণ্টা ধরে ছাত্রীদের আটকে রেখেছিল এবং মধ্যরাতে ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিন্দুমাত্র না ভেবেই বেআইনিভাবে তাদের ছাড়া হয়। হাইকোর্ট আইজিপি-র নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্ত টিম (সিট) গঠন করে রিপোর্ট মানবাধিকার আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলাটির মানবাধিকার লঙ্ঘন, এসসি-এসটি বিশেষ আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত দিকটি পশ্চিম মেদিনীপুরের মানবাধিকার তথা সেশন কোর্টে যাবে। সেখানে এই রায়ের ভিত্তিতে কেস চালু হবে। মামলাটির বাকি দিক হাইকোর্টে বিচার প্রক্রিয়াধীন থাকবে।

এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, পুলিশ যদি সরাসরি অপরাধের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে, যা আর জি কর ঘটনাতেও দেখা গিয়েছিল তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এসব ঘটনা সরকারের আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ততাকেই উন্মোচিত করছে।

আক্রান্ত ছাত্রীদের পক্ষ থেকে মামলার মূল পিটিশনার সুশ্রীতা সরেন বলেন, আর জি করের ঘটনা সহ প্রতিবাদী ছাত্রকে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে পিষে দেওয়া, ছাত্রীদের উপর পুলিশি হেফাজতে নৃশংসতা, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল প্রভৃতি অসংখ্য ঘটনার পেছনে থাকা দুর্নীতিচক্রকে আড়াল করতেই রাজ্য সরকার চূড়ান্ত মিথ্যাচার ও দমনমূলক ভূমিকা নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের যে আইনি লড়াই চলছে তা সফল করতে ও শাসকের স্বৈরাচার রুখে দিতে রাজপথের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্যের ছাত্রসমাজ সহ সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।'

স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে গ্রাহক-বিক্ষোভ

বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো বন্ধ, বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, চাষের মরশুমে লাইন না কাটা, গৃহস্থের মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ছাড়, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও এলপিএসসি (জরিমানা) মকুব, অন্যায় ভাবে লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় না করে গ্রাহকদের জমা রাখা সিকিউরিটির উপর আইনসম্মত সুদ দেওয়া সহ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি দাবি নিয়ে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে ১-৭ এপ্রিল সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহের অঙ্গ হিসাবে ৭ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পুরাতন বাজারে প্রতীকী স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। সংগঠনের আহ্বানে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ সপ্তাহ পালিত হয়।

যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে হলদিবাড়িতে শিশু-কিশোর মিছিল

প্যালেস্টাইনের গাজা সহ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শিশু হত্যার প্রতিবাদে ১৪ এপ্রিল কমসোমলের সংগঠক প্রদীপ রায় বলেন, গাজায় যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। ইউক্রেনে, ইরাকের যুদ্ধে বহু শিশু প্রাণ হারিয়েছে। যুদ্ধ বন্ধের দাবিতেই এই মিছিল। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ সহ দেশে দেশেই মৌলবাদ আজ মানবজাতির কাছে বড় বিপদ। এই মিছিল মৌলবাদের বিরুদ্ধেও। মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য কমসোমলের উদ্যোগে কিশোরদের নিয়ে নিয়মিত দেশের নবজাগরণের মহাপুরুষ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন সংগ্রাম চর্চা করা হয়।

কোচবিহারের হলদিবাড়ি বাজারে মিছিল করল এস ইউ সি আই (সি) দলের কিশোর সংগঠন কমসোমল। শিশু-কিশোররা মিছিল থেকে আওয়াজ তোলে, 'মৌলবাদ নিপাত যাক', 'শিশুঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করো'।

২৪ এপ্রিল এসইউসিআই(সি)-র ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কেন্দ্রীয় অফিসে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

মিসাইল কেন্দ্র বিরোধী বাইক র‍্যালি জুনপটে

১৩ এপ্রিল পরিবেশ রক্ষার স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে প্রায় শতাধিক মোটর সাইকেল মিছিল জুনপুটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। জুনপুটে মিসাইল ও হরিপুরে পরমাণু চুল্লি বিরোধী গণপ্রতিরোধ মঞ্চ, কন্টাই সায়েন্স সেন্টার, কাঁথি উপকূলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, মানবাধিকার

সংগঠন সিপিডিআরএস-এর মতো পাঁচটি সংগঠনের ডাকে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইআইএসইআর কলকাতার বিজ্ঞানী অধ্যাপক অয়ন ব্যানার্জী, বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়(ছবি), ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক নীলেশ রঞ্জন মাইতি, রাজ্য সম্পাদক তপন কুমার শী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিজ্ঞানীরা। 'হাজার হাজার মৎস্যজীবী ও গ্রামবাসীকে জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে এবং উপকূল এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে উৎক্ষেপণ কেন্দ্র একদম উচিত হবে না বলে জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

তাঁরা বলেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সহ বেশির ভাগ দেশেই রয়েছে একটা করে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। ভারতে ওড়িশার চাঁদিপুর এবং তামিলনাড়ুর শ্রীহরিকোটাতে ইতিমধ্যে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র রয়েছে। তারপরও যদি আবার একটা মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র করতেই হয় তা হলে জনমানবশূন্য কোনও স্থানে তা করা হোক, মৎস্যজীবীদের উচ্ছেদ করে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে জুনপুটে নয়। জুনপুটে সরকারের পক্ষ থেকে মৎস্য সংরক্ষণ শিল্প, পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হোক। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সেখানে একটি প্রতীকী বটগাছের চারা পোঁতা হয়। বাইক মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় জুনপুটের মৎস্যজীবী ও এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামে গ্রামে মহিলারা এই বাইক মিছিলকে স্বাগত জানান।

রাজনীতি বুঝতে হবে

পাঁচের পাতার পর

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ব্যাপ্ত করে রয়েছে রাজনীতি। যতদিন আপনারা তা না বুঝবেন, ততদিন ভোটলোভী, ক্ষমতালোভী নেতাদের প্রতারণার শিকার হতে হবে। তিনি বলেন, নামে যতগুলিই হোক, বাস্তবে দেশে দুটি মাত্র দল আছে— একদিকে পুঁজিবাদের স্বার্থের রক্ষক দলগুলি, অন্যদিকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রকৃত সংগ্রামে রত বিপ্লবী দল।

এই প্রসঙ্গে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলটির কার্যকলাপকেও প্রতি মুহূর্তে বিচার করে দেখার আবেদন করেন। পাশাপাশি, এলাকার নানা দাবি নিয়ে এগিয়ে এসে গণকমিটি গঠনের উপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, যে গণকমিটিগুলির নেতৃত্বে থাকবেন রাজনৈতিক নেতারা নন, সাধারণ মানুষই। তাঁরাই নিজেদের দাবি-দাওয়া বুঝে নিতে আন্দোলনের রাস্তা ঠিক করবেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এলাকার শিশু-কিশোরদের বাঁচান। তাদের মনীষীদের শিক্ষার সাথে পরিচয় ঘটানোর দায়িত্ব নিন সকলে। তিনি আরও বলেন, দাবি আদায় না হলেই হতাশ হয়ে পড়ার কারণ নেই। প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যায় সহ্য করে যাওয়াও একটা অপরাধ। ভোটমুখী রাজনৈতিক দলগুলির ছড়ানো ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতের প্ররোচনায় পা না দিয়ে অত্যাচারিত, শোষিত, খেটে-খাওয়া মানুষকে নিজেদের জীবনের প্রতিটি দাবি নিয়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় তখন ভরে উঠছে ময়দানের আকাশ-বাতাস। শপথদৃঢ় হৃদয়ে একে একে এলাকায় ফিরে চললেন অন্যায় প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহে উজ্জীবিত গণআন্দোলনের হাজারো সৈনিক।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com